খাদ্য অপচয় রোধ করার তাগিদ

মুশফিকুর রহমান

জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (ইউনেপ) গত ২৭ মার্চ ২০২৪ 'খাদ্যপণ্য অপচয় সূচক ২০২৪' প্রকাশ করেছে। ২০২৪ সালে প্রকাশিত সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশে বাড়িতে (বা খানায়) এক বছরে গড়ে প্রায় ৮২ কেজি খাদ্যসামগ্রী অপচয় করা হয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশে গৃহস্থালী পর্যায়ে বছরে গড়ে প্রায় ১৪.১০ মিলিয়ন টন খাদ্যসামগ্রী অপচয় হয়। এক্ষেত্রে খাদ্যপণ্য অপচয় করার ঘটনা গ্রামাঞ্চলে যা ঘটে তার চেয়ে শহরাঞ্চলের বাসাবাড়িতে বেশি ঘটে বলে অনুমান করা যায়। বাংলাদেশের মতো নিম্নআয়ের দেশে এতো বিপুল পরিমাণ খাদ্য অপচয় রীতিমতো বিস্ময় জাগানিয়া সংবাদ।

ইতিপূর্বে প্রকাশিত সূচকের তুলনায় বিশ্বজুড়ে খাদ্যপণ্যের অপচয় বেড়েছে। প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালে বাংলাদেশে বছরে প্রতি বাড়িতে গড়ে প্রায় ৬৫ কেজি খাদ্যসামগ্রী অপচয় করা হয়েছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশে বাসাবাড়িতে বছরে প্রায় ১০.৬২ মিলিয়ন টন খাদ্যবস্তু অপচয় বা নষ্ট হয়েছিল।

বাংলাদেশ সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রকাশিত 'খানা জরিপ ও ব্যয় সমীক্ষা রিপোর্ট, ২০২২' এর তথ্য অনুযায়ী, দেশে দারিদ্র্য হ্রাস পেলেও এখন পর্যন্ত ১৮.৭% মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে এবং ৫.৬% মানুষ চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। তুলনা হিসেবে বলা যায়, ভুটানে মাথাপ্রতি বছরে গৃহস্থালী পর্যায়ে খাদ্য অপচয়ের পরিমাণ ১৯ কেজি, ভারতে ৫৫ কেজি, চীন ও শ্রীলংকায় ৭৬ কেজি, মালদ্বীপে ২০৭ কেজি, পাকিস্তানে ১৩০ কেজি, আফগানিস্তানে ১২৭ কেজি, নেপালে ৯৩ কেজি, বেলজিয়ামে ৭১ কেজি, নিউ জিল্যান্ডে ৬১ কেজি ও রাশিয়ায় ৩৩ কেজি।

জাতিসংঘের গবেষণা রিপোর্ট অনুমান করেছে যে, ২০২২ সালে বিশ্বে প্রায় এক বিলিয়ন (এক হাজার মিলিয়ন) মানুষের অন্তত একবেলার খাবার গৃহস্থালী আবর্জনা হিসেবে ফেলে দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে, ৭৮৩ মিলিয়ন বিশ্ববাসী খাদ্যসঙ্কটে এবং বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় বিপন্ন। ইউনেপ-এর নির্বাহী পরিচালক ইনগার এন্ডারসন খাদ্যপণ্যের অপচয়কে 'বৈশ্বিক ট্রাজেডি' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন । তার মতে, 'খাদ্যপণ্যের অপচয় কেবল উন্নয়নের ইস্যু নয়, প্রকৃতি ও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু'।

২০২২ সালের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, খাদ্যপণ্যের অপচয় উদ্বেগ এবং শঙ্কার বিষয় হলেও বিশ্বে গৃহস্থালী বর্জ্যের প্রায় ৬০% খাদ্যপণ্য। বাণিজ্যিকভাবে যে প্রতিষ্ঠানসমূহ খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করে, অপচয় করার ক্ষেত্রে তাদের দায় প্রায় ২৮% এবং খুচরা পর্যায়ের বিপণনকারীদের দায় ১২%। তাছাড়া খাদ্য

উৎপাদনের জন্য ফসলের মাঠ থেকে বাজারজাত করার প্রক্রিয়ায় আরও প্রায় ১৩% খাদ্যসামগ্রী অপচয় বা নষ্ট হয় ।

আর্থসামাজিক সমস্যা হিসেবে খাদ্যপণ্যের অপচয় প্রসঙ্গ কিছুটা আলোচিত বিষয়। কিন্তু বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন এবং তা থেকে সৃষ্ট সঙ্কটে নষ্ট ও অপচয় করা খাদ্যপণ্যের ভূমিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার উপাদান। ছুঁড়ে ফেলা খাদ্যসামগ্রী চাষাবাদ ও প্রক্রিয়াকরণে প্রকৃতির আলো, হাওয়া, জল, জৈব ও অজৈব উপাদান ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার হয় এবং এ প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট মাত্রায় পরিবেশের দূষণ ঘটে। খাদ্য উৎপাদনের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে ক্রমাগত নিবিড় চাষাবাদের প্রয়োজন বাড়ছে। রাসায়নিক ও জৈব সার, কীটনাশক ও সেচের ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। নির্বাচিত ফসল ও আমিষের উৎপাদন বাড়াতে জীববৈচিত্র্যের সঙ্কোচন এবং অনেক ক্ষেত্রে বিলুপ্তি অবধারিত হচ্ছে। বন ও জলাভূমি উজাড় করে চাষের জমি, পশুচারণ ভূমি তৈরি হচ্ছে। স্থানিক ভৌত, সামাজিক পরিবেশ, মানুষের ও জীবজগতের বসবাসের পরিবেশ ব্যাপকভাবে বদলে যাচ্ছে। এত বিপুল আয়োজনে যে খাদ্য উৎপাদান বাড়ানো হচ্ছে, তার বিপুল অংশ যদি অপচয় হয়, ফেলে দেওয়া হয়, তা কেবল অনৈতিক নয়; একইসাথে প্রকৃতি ও পরিবেশের বিবেচনায় অপরাধও বটে।

অপরদিকে, খাদ্যসামগ্রী (উচ্ছিষ্টসহ) পরিবেশে নিক্ষিপ্ত হলে তা পরিবেশের নানামুখী দূষণ ঘটায়। খাদ্য উপাদান পচে গেলে অন্যান্য উপাদানের সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড ও মিথেন গ্যাস নিঃসরণ করে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং পরিবেশের নেতিবাচক পরিবর্তন ত্বরান্বিত করতে উল্লিখিত দুটি গ্যাস অন্যতম বড় ইন্ধন। মানুষের বিবেচনা বোধ ও সংযমের অভাব এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করছে। বাজারে গিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য (এবং অন্যান্য ভোক্তাপণ্য) কেনার ক্ষেত্রে কেবল হঠাৎ ধনসম্পদের মালিক নয়, নেহায়েত সাধারণ মানুষও কম যায় না। একইভাবে পাতে খাবার তুলে নেবার সময় কেবল ধনী মানুষ নয়, গরীব মানুষও খাবার গ্রহণের সাধ্যের বেশি খাবার তুলে নেয়। ফলে অপচয় এবং খাবার নষ্ট করা নিয়মিত ব্যাপার হয়ে যায়।

মানুষ যদি খাদ্যবস্তু প্রকৃত প্রয়োজনের নিরিখে কেনে, রান্না করে বা প্রক্রিয়াজাত করে এবং খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে, তাহলে পৃথিবীতে খাদ্যসামগ্রীর চাহিদা অনেকটুকু কমে যাবে। ভারসাম্যপূর্ণ ও সুষম খাবার গ্রহণের অভ্যাস রপ্ত করলে জীবনযাপন অনেক সহজ এবং স্বাস্থ্যসম্মত হবে। রোগ বালাই অনেক কম কষ্ট দেবে। পরিবেশ সুস্থ ও নির্মল থাকবে। প্রকৃতির বৈচিত্র্য অটুট থাকবে। মানুষের জীবন ও জীবিকার বর্তমান ও ভবিষ্যতের অসংখ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপাদান চারপাশের পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করার সুযোগ অব্যাহত থাকবে। এজন্য পরিমিতির জীবনযাপনের সংস্কৃতি গড়ে তোলা, নিজের চারপাশের এবং বৈশ্বিক পরিবেশের প্রতি সচেতন ও দায়বদ্ধতা তৈরি করা প্রয়োজন। এজন্য কিছু অপ্রয়োজনীয় অভ্যাস থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হবে। প্রযুক্তির সুবিধাগুলোকে কাজে লাগিয়ে, উদ্ভাবনী মন ও প্রচেষ্টা কাজে লাগিয়ে খাদ্যসামগ্রীর টেকসই সংরক্ষণ সুবিধা আরও দক্ষভাবে ব্যবহার করতে হবে।

শিল্প উন্নত দেশগুলোর সাথে (যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, জাপান) দক্ষিণ আফ্রিকা, মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া ২০০৭ সাল থেকে খাদ্যবস্তুর অপচয় অনেকাংশে হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, জাপান উল্লিখিত সময় থেকে শুরু করে প্রায় এক তৃতীয়াংশ, যুক্তরাজ্য প্রায় ১৮ শতাংশ পরিমাণ খাদ্যসামগ্রীর অপচয় হ্রাস করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে খাদ্যসামগ্রীর অপচয় কমাতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়েছে। যেমন, যুক্তরাজ্যের সরকার খাদ্যসামগ্রীর অপচয় হ্রাস এবং আবর্জনার ভাগাড়ে নির্বিচারে খাদ্যবস্তু নিক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ করার নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে পৌর সভাগুলোকে তহবিল সহায়তা দেওয়া, মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি, অন্যান্য আবর্জনার সাথে খাদ্যবস্তু আবর্জনার ভাগাড়ে না ফেলে তা সংগ্রহ করে কম্পোস্ট সার তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। এ সকল পদক্ষেপ মানুষের অভ্যাস বদলে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি মানুষের দায়বদ্ধ আচরণ উৎসাহিত করছে।